সাহিত্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ - ১৩১২ বঙ্গাবাদ)

ড. স্বরূপ দে

সারসংক্ষেপ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ খ্রি.-১৮৯৪ খ্রি.) এপ্রিল, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে (বৈশাখ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ করেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। বঙ্কিম পরবর্তী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ খ্রি. - ১৮৯৯ খ্রি.) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন। তিনি বৈশাখ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে চৈত্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন। যদিও মাঝে কিছু সংখ্যা বেরোয়নি। এরপরে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পরিচালনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁর পরিচালনায় মাত্র চারটি সংখ্যা বেরোনোর পর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' এর প্রতি রুষ্ট হন। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে নির্দেশ দেন 'মাঘ' সংখ্যা পরবর্তী কোন সংখ্যা যাতে না বের হয়। এর অনেগুলি বছর পর বিংশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ খ্রি. - ১৯৪১ খ্রি.) সম্পাদনায় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার 'নিবেদন' অংশটি লেখেন শ্রীশচন্দ্র। ১৩০৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ১৯০১ থেকে ১৯০৫ খ্রি.) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। মোট ষাটটি সংখ্যা এই সময় বের হয়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বঙ্কিম আদর্শকে মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' সমাজভাবনা, ইতিহাস ভাবনা, স্বদেশ ভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা, বিজ্ঞান ভাবনা ও সর্বোপরি সাহিত্য ভাবনাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দুটি দিক যথা সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা– দু'দিকেই সমান দৃষ্টিপাত রেখে বিশ্লেষণ করেন। সাহিত্য ভাবনায় তিনি নব নব পরিসর সৃষ্টি করেন এই 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। রবীন্দ্র ভুবনে সাহিত্য ভাবনার ক্ষেত্রে এই 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সূচক শব্দ: *রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা*

'বঙ্গদর্শন' (এপ্রিল, ১৮৭২ খ্রি.) পত্রিকা প্রকাশ বাংলা সাময়িকপত্র তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পরবর্তী ধারার ধারাবাহিক গতানুগতিকতাকে ভেঙে এক নব প্রাণস্পন্দে সজ্জিত হয়ে বাঙালি, ভারতীয় তথা বিশ্বসত্তায় উন্মোচিত হয়েছিল। মানুষের আবেগ, চিন্তা, জ্ঞান, তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, সামাজিক পরিধি, প্রতিবাদ স্পৃহাকে শুধু জাগ্রত করেছিল তাই নয়, মানব মুক্তি মানব স্বাধীনতা মানব-মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। আর এই পুরো কর্মকাণ্ডের পেছনে পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮ খ্রি.-১৮৯৪ খ্রি.)। ১৮৭২ খ্রি. এপ্রিল মাসে বাংলা সাল হিসেবে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১ খ্রি.-১৯৪১ খ্রি.) মাত্র এগারো বর্ষীয় বালক। ফলে সেই সময় 'বঙ্গদর্শনে'র মাহাত্ম উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের বয়সোপযোগী না হলেও, পরে পরে স্মৃতি রোমন্থন করে পত্রিকার সজীবতা ও বিশিষ্টতা অনুভব করে বলেন:

> ''বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজদুন্নতধ্বনিঃ।' এখন মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।''[১]

রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁর ভাই শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের আগ্রহ ও উৎসাহে ১৯০১ খ্রি. (১৩০৮ বঙ্গাব্দ, ১লা বৈশাখ) 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে নেপাল মজুমদার বলেন:

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হিজলী কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

> ''১৩০৮ সালের প্রথম ভাগেই রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন নবপর্যায় বাহির হয়।''[২]

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমের বাঙালি সত্তার সার্বিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে, সম্পাদক হয়ে 'নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন'কে পরিচালিত করেন। 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র সূচনা বক্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য:

> ''লোকমনমোহিনী বহুমুখী প্রতিভার ফলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত; মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হইক!''[৩]

'বঙ্গদর্শন' ও 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র মদ্য সময়ের ব্যবধান অনেক। প্রায় তিন দশক। ফলতঃ 'বঙ্গদর্শন' ও 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র মধ্যে এই সময়গত পরিবর্তনে পটভূমির পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন গঠন কাঠামো ও আঙ্গিকের। পরিবর্তন ঘটেছে রাজনৈতিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনার। নগরাঞ্চলের বিস্তার ঘটেছে, পরিবর্তিত হয়েছে গ্রামাঞ্চল তথা গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারণা। রাজনৈতিক অবস্থানেও নতুন দিক দিশা গড়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে ধর্মের আদর্শ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রকৃতি। ইতিহাসবোধ, ইতিহাসের ধারণা, তথ্য সংগ্রহ ও যুক্তি মনস্কতার ক্ষেত্রেও ঘটেছে বিপুল পরিবর্তন তথা বিবর্তন। পাশ্চাত্য দোলার পশ্চিমী ভাবুকতার স্পর্শে মানুষ অনেক বেশি আধুনিক হয়ে উঠেছে। পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ ভাবনার বিভিন্ন দিকেরও। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, সমাজে, জীবনচর্যায়, প্রাত্যহিক জীবনে, মানবিক মূল্যবোধে ও মানবিক আদর্শে, বঙ্কিম যুগের, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের যুগের ভাবাদর্শ ও জীবন ভাবনা, অনেকটা বিবর্তন হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সূচনায়। ফলে সাহিত্যের প্রকরণেও নতুন ভাবরাজির উদয় হয়েছে। সাহিত্য শাখারও কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সংযুক্ত হয়েছে ছোটগল্পের। পূর্ববর্তী ধারা থেকে কবিতার মানসপট ও কলেবর দুটোই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র বিষয় ভাবনার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন সমাজ-ভাবনা, ইতিহাস ভাবনার পরিচয় উঠে এসেছে তেমনি, অপরদিকে বিজ্ঞান ভাবনা ও অর্থনৈতিক চিন্তারও দিশা প্রকট হয়েছে। আবার একদিকে যেমন স্বদেশ ভাবনা, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি আবার সাহিত্যচিন্তা, ভাষাচিন্তা, সাহিত্যের জীবন জিজ্ঞাসার আঙ্গিকও আলোক-দৃশ্য হয়েছে। যদিও পূর্বেকার বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। সমালোচক সুকুমার সেনের মত এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক:

> ''১৮১৮ খ্রি. হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি দেখিতেছি যে বাংলা গদ্য সাহিত্য (এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানত সাময়িক পত্রের আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়োছে। বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রকাশপত্র বলিয়াই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাহিত্য, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরনীয় হইয়াছে।''[৪]

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' এই সকল সাময়িক পত্রের বিষয় ভাবনা ও জীবন ভাবনাকে সামাহিত করে নবগঠিত হয়ে নব প্রাণস্পন্দে দোলায়িত হয়ে সাহিত্য ভাবনাকে মেলে ধরেছে।

সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশ তথা বাস্তবজগৎ, বিশ্ব প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কল্পনার রঙে, সৌন্দর্যের মাধুর্যে রূপায়িত হয় তার গঠনসৌষ্ঠব, ভাষা ও শৈলী। অ্যারিস্টটল তার 'Poetics' গ্রন্থে ইতিহাস তথা বিজ্ঞানের সত্যের উপর সাহিত্যের সার্বজনিক সত্যকে স্থান দিয়েছিলেন। ''I propose to treat of poetry in itself

and of its various kinds, nothing the essential quality of each; to enquire into the structure of the plot as requisite to a good poem; into the number and nature of the parts of a poem is composed; and similarly into hot ever halls with in the same enquary."[৫] মার্কিন কবি আর্চিবল্ড ম্যাকলিশের কথায়– "A poem should not mean/but be."[৬] 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' ও সেই সাহিত্যের সার্বজনীক সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়েছিল।

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' বিভিন্ন লেখক তাদের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক মত ব্যক্ত করেছেন। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রী ব্রহ্মবান্ধব উপাদ্যায়, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জগদানন্দ রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রিয়ম্বদা দেবী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ দে প্রমুখ। তবে এদের মধ্যে অগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথ। যে সাহিত্যচিন্তা বঙ্কিচন্দ্র থেকে শুরু হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা করতে গিয়ে তাঁকে 'সাহিত্যে কর্মযোগী' আখ্যা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য:

> "বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাহাকে আহ্বান করিয়াছে।
>
> সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"[৭]

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' বিভিন্ন লেখকের তাঁদের সাহিত্যিক মনের পরিচয় ব্যক্ত করলেও, সাহিত্যের রূপ, আঙ্গিক, তত্ত্ব ও সমালোচনার দিক, সবেতেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃত্ব ফলিয়েছেন। সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ শুধু এক চর্চা হিসেবে ধরেনি, তাকে মানব সমাজের সঙ্গে, বিশ্বসংসারের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই সাহিত্য হয়েছে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। এ প্রসঙ্গে W.H. Hudson এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> "A great book grows directly out of life; in reading it, full are brought into large, close and fresh relation with life; and in the fact list the final explanation of its power. Literature is a a vital record of what men have seen in life, what they have experienced of it, what the have thought and felt about those accept of it which have the most immediate and in during interest for all of us."[৮]

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তার দুটো দিক পাওয়া যায়। যথা এক, সাহিত্যতত্ত্বের দিক, দুই. সাহিত্য সমালোচনার দিক। তত্ত্বের দিককে আমরা সাহিত্যতত্ত্ব বলি। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, "সাহিত্য সমালোচনা দুটি দিক। একটি তত্ত্বের, একটি প্রয়োগের। দুই দিকের দুই রূপ। তত্ত্বের দিকের রূপটি বলি সাহিত্যতত্ত্ব। অর্থের যৎসামান্য ইতর বিশেষক অগ্রাহ্য করলে তাকে ইংরেজি করে পোয়েটিক্সও বলতে পারি, থিয়োরি অব লিটারেচারও বলতে পারি, এমনকি ফিলসপি অব লিটারেচার বা সাহিত্যদর্শনও বলতে পারি। সাহিত্য যেমন শিল্প সাদনের একটি শাখা সাহিত্যতত্ত্বকেও তেমনি শিল্পতত্ত্বের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়"[৯]

তবে এই সাহিত্যতত্ত্বের বিষয় বিভিন্ন সময়ে বিবর্তন তথা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব এর প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ভরত মুনি। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কে সৃষ্টি ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে তার 'নাট্যশাস্ত্র' নামে আকর গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় তাঁর স্রষ্টা হলেন অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটলের

'পোয়েটিকস্' বা 'কাব্যতত্ত্ব' এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কাব্যতত্ত্ব ৩৩৫খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের রচিত বলে মনে করা হয়।[১০] ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত রয়েছে। কাব্যের জন্ম- উৎস, লক্ষণ, ফল, কাব্যের প্রকরণ কৌশল, বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে বেদ-উপনিষদ বাহিত ধারণা, ব্রহ্ম-স্বাদের তুরীয়ানন্দ সম্পর্কিত ধারণা, অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র মান্য করা, রাজতন্ত্র আশ্রিত সমাজব্যবস্থায় নির্ভরতা মিলে এই সাহিত্যতত্ত্বের একটি আদিরূপ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে মুঘল পাঠান শাসনকালে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল আলোড়ন তা ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ক্রমে এই সাহিততত্ত্ব সংস্থা ও উপভোক্তার সমকাল সম্পৃক্ত জাগ্রত চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যদিও শিল্প উপভোগের ও নান্দনিকবোধের বহু সূদতর উন্মোচিত করতে পারে বলে এই সাহিত্যতত্ত্ব নন্দন ভাবনার বিশিষ্ট আকর রূপে সম্মানিত। নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র পাতায় রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের সেই নির্যাস রস পরিস্ফুট হয়েছে।

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের যে সকল সাহিত্য ভাবনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি, নিম্নরূপ:

১) 'জুবেয়ার' (বৈশাখ, ১৩০৮ ব.)

২) 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (পৌষ, ১৩০৮ ব.)

৩) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (শ্রাবণ, ১৩০৯ ব.)

৪) 'শকুন্তলা' (আশ্বিন, ১৩০৯ ব.)

৫) 'মন্ত্র' (কার্তিক, ১৩০৯ ব.)

৬) 'সাহিত্য সমালোচনা' (আশ্বিন, ১৩১০ ব.)

৭) 'সাহিত্যের সামগ্রী' (কার্তিক, ১৩১০ ব.)

৮) 'সাহিত্যের তাৎপর্য' (অগ্রহায়ণ, ১৩১০ ব.)

৯) 'রামায়ণ' (পৌষ, ১৩১০ ব.)

১০) 'মেঘদূত' (শ্রাবণ, ১৩০৮)

তবে উপরিউক্ত সব প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেননি। 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র যে প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বের ধারণাকে ব্যাখ্যা ও ব্যক্ত করেছেন সেগুলি হল, সাহিত্যের সামগ্রী ও সাহিত্যের তাৎপর্য। তবে অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে সাহিত্যতত্ত্বের কথা আংশিকভাবে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' ব্যতীতও তিনি সাহিত্যতত্ত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। যেমন,

১) 'সাহিত্যের বিচারক'

২) 'সৌন্দর্যবোধ'

৩) 'বিশ্বসাহিত্য'

৪) 'সাহিত্য সৃষ্টি'

৫) 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য'

৬) ‘সাহিত্য’

৭) ‘সাহিত্যের প্রাণ’

৮) ‘মানবপ্রকাশ’

৯) ‘সাহিত্যের গৌরব’

১০) ‘সাহিত্যের সৌন্দর্য’ ইত্যাদি

প্রসঙ্গত দীনেশচন্দ্র সেনও ‘সাহিত্যের আদর্শ’ (মাঘ, ১৩১০ ব.) নামে একটি সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’।

রবীন্দনাথ ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’ কখনো সরাসরি সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন, আবার কখনো বা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচন সূত্র ধরে সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ এনেছেন। কখনো আবার রেফারেন্স হিসেবে সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আদিত্য ওহদেদারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য:

> ‘‘বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্ব গঠিত আলোচনার সূত্রপাত করেন,
> বঙ্কিমের পর সাহিত্যতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য আলোচনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পাই।’’[১১]

নিম্নে ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’ রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন দিকে পরিচয় ব্যক্ত করা হল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ, ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। সাহিত্য কি, এর উদ্দেশ্য কি, এর উপকরণ কি, সাহিত্য সৃষ্টি করতে কি কি প্রয়োজন, লেখকের করণীয় কাজ কি, কিভাবে একটি সাহিত্য পাঠক হৃদয় সমাদৃত হয় তার পুঙ্খনাপুঙ্খ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে করেছেন। সাহিত্য মানুষকে সুখী করে, আনন্দ যোগায়, জীবনের ভেতরকার আমি কে জাগ্রত করে। সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ আনন্দের ফুসরত পায়। তাই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সুখ ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করার কথা বলেছেন। ‘সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধটিও তার ব্যতিক্রম নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন সুখ ও সৌন্দর্যের দ্বারাই মানুষ মানসিক সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করে। এবং সেই সুখ সাহিত্যই দেয় একথাও তিনি স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর বক্তব্য:

> ‘‘অন্যান্য সুখ পৌণঃপূণ্যে অপ্রীতিকর হইয়া ওঠে, সৌন্দর্য্যজনিত, সুখ, চিরনূতন ও চিরপ্রীতিকর।’’[১২]

সাহিত্য হল সাহিত্যিকের দ্বারা গঠিত একটি সৃজনশীল বস্তু, যার বাইরের আভরণ ভাষা এবং ভেতরের আভরণ লেখকের মনন তথা জঠরের জারকরস। তাই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য গড়ে তোলার জন্য দুটি প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কথা বলেছেন। যথা- এক. বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দুই. তা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হয়েছে কতটা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> ‘‘বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।... তাহার সঙ্গে আমাদের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত-তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।’’[১৩]

অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি মানব-মনের হৃদয় ভিত্তিতে নানা রঙে, নানা ছন্দে নানা রসে আভাসিত হয়ে উঠছে। এখন প্রশ্ন হলো সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি। কিভাবে সাহিত্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্য প্রাণবন্ত, সজীব হয়ে

ওঠার পেছনে উপাদানের প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি দুটি উপকরণ এর যথাক্রমে চিত্র ও সংগীতের কথা উল্লেখ করেছেন।

সাহিত্যকে তুলে ধরতে গেলে আভাস, ইঙ্গিত, রূপকের অর্থাৎ অলংকার এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই অলংকার সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে না বরং সাহিত্যকে সজীবতা প্রাপ্ত করে। আর যে কথা কথার দ্বারা বলা যায় না, তাকে চিত্রের দ্বারা ব্যক্ত করলে তা অনেক মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যের কাজ নারীর কাজ। নারীর যেন শ্রী স্ত্রী আছে, সাহিত্যের তেমন শ্রী স্ত্রী থাকা প্রয়োজন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''অপরূপ রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।''[১৪] সাহিত্যে চিত্র ও সংগীত সেই ভূমিকা পালন করে। কেননা চিত্র ভাবকে আকার দেয়, সংগীত ভাবকে প্রতিদান করে। চিত্র হলো দেহ আর সংগীত হল সাহিত্যের প্রাণ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> ''ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে চিত্র এবং সংগীত।''[১৫]

চিত্র ও সংগীত এই দুই উপকরণ সাহিত্যে স্বীকার্য। তবে চিত্র ও সংগীত তখনই যথার্থ সাহিত্যরূপ প্রদান করে যখন তা মানব হৃদয় ও মানব চরিত্রের সঙ্গে অর্থাৎ পাঠক হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গীকৃত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র।''[১৬] তবে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে শেষ অংশে সাহিত্যকে দৈববাণী আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। ভগবান আনন্দ সৃষ্টির জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আবার মানুষ আনন্দের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাই সাহিত্য সেই ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতের আমাদের অন্তরে রাগিনী বাজিয়ে দিচ্ছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> ''সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ নহে তাহা রচয়িতার নহে তাহা দৈববাণী।''[১৭]

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'সাহিত্যের সামগ্রী'। প্রবন্ধটি কার্তিক, ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি সুখ ও আনন্দকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, সাহিত্য কেবল নিজের আনন্দের জন্য নয়, তা সকলের আনন্দের জন্য। সাহিত্য যখন তার নিজের সীমাকে অতিক্রম করে সকলের সীমায় পৌঁছায় তাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সফল হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> ''একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্য লেখা সাহিত্য নহে। অনেক কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখি যেমন নিজের উল্লোসে গান করে লেখক এর রচনা উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত, পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। পাখির গানের মধ্যে পক্ষী সমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা-কিন্তু লেখক এর প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ।''[১৮]

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যের লক্ষ্য পাঠক সমাজ। আর 'নীরব কবিত্ব' ও 'আত্মগত ভাবোচ্ছাস' সাহিত্যে দুটি বাজে কথা। রবীন্দ্রনাথ এও বলেন সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ মানুষের অন্তরে যুগে যুগে কালে কালে বেঁচে থাকে। তাই সাহিত্যকে প্রকাশ করতেই হয়। এ প্রসঙ্গে সম্রাট অশোকের কথা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়া ছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়েছিলেন।''[১৯] সকল মানুষেরই একমাত্র লক্ষ্য মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকা। সাহিত্য ঠিক এই কাজটি করে। চিরস্থায়িত্বর চেষ্টায় সাহিত্যে বড় চেষ্টা। তাই জ্ঞান নয় ভাবই সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য:

> ''অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।''[২০]

আর ভাবকে নিজের করে সকলের করে তোলাই সাহিত্য তথা ললিতকলা। ''সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের।''[২১] এ প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন:

> ''কথাগ্রন্থ নূতন সৃষ্টি।.... কথাগ্রন্থে প্রতিভার প্রয়োজন আছে বটে।''[২২]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সাহিত্য হতে গেলে কি কি আবশ্যিক তার কথা 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' ও 'সাহিত্যের সামগ্রী' তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে', 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'মহাকাব্যের লক্ষণ', 'সাহিত্যের বিচারক', 'সাহিত্য ও ব্যাকরণ', প্রভৃতি প্রবন্ধের বিভিন্ন আলোচনা সূত্রে সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যান্য প্রাবন্ধিকরাও বিশেষত দীনেশচন্দ্র সেন ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর লিখিত প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র 'নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনে'ই সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তা নয়। অন্যান্য বিভিন্ন পত্রিকাতেও তার সাহিত্য ভাবনা ও সাহিত্যতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হল,

ক্রমিক সংখ্যা	**সাহিত্য**	**পত্রিকা**	**প্রকাশকাল**
১)	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	ভারতী	ফাল্গুন, ১২৮৮ ব.
২)	মেঘদূত	সাহিত্য	অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ ব.
৩)	কাব্য	সাধনা	চৈত্র, ১২৯৮ ব.
৪)	বঙ্কিমচন্দ্র	সাধনা	বৈশাখ, ১৩০১ ব.
৫)	কাদম্বরী চিত্র	প্রদীপ	মাঘ, ১৩০৬ ব.
৬)	বাস্তব	সবুজপত্র	শ্রাবণ, ১৩২১ ব.
৭)	সভাপতির অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ব.
৮)	সাহিত্য বিচার	প্রবাসী	কার্তিক, ১৩৩৬ ব.
৯)	সাহিত্যে আধুনিকতার	পরিচয়	মাঘ, ১৩৪১ ব.

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে অগ্নিপত্রটি জ্বালিয়ে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের হাত থেকে সেই সাহিত্য যুগের অগ্নিপত্রটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাই মোতিলাল মজুমদারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক:

> ''বঙ্কিমচন্দ্রই যে নব্য বাংলা সাহিত্যের পত্তন করেছিলেন, ...রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধক-মূর্তি দেখেছিলেন, ...বঙ্কিম সাহিত্যে যে ফল-ফুলের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তিনি সেগুলেকে বিকশিত ও পল্লবিত করে তুলেছিলেন।''[২৩]

এ প্রসঙ্গে আদিত্য ওহদেদারও বলেছেন,

> ''সাহিত্য জিজ্ঞাসা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজীবন যতটা নিজের মনকে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত রেখেছিলেন এমন এদেশে আর কারুর মধ্যে এ যাবৎ দেখা যায়নি, বিশ্বের আর কোন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।''[২৪]

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪৩২

২। মজুমদার, নেপাল: ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিকেশন, ১৯৯৫, পৃ. ১৮২

৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ: সূচনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রথম খণ্ড, প্রথমবর্ষ, মজুমদার লাইব্রেরি, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪

৪। সেন, মজুমদার: বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, দ্বিতীয়, ১৭৮৫-১৮৪৭, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৯

৫। Butcher, S.H: The Poetics of Aristotole, Macmillan and Co. limited, The Macmilian Company, Third Edition 1902, New York (www.denisdutten.com)

৬। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল: সাহিত্যের রূপ-রীতি অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, সপ্তম মুদ্রণ: নভেম্বর ২০০৯, কলকাতা-৯, পৃ. ১৪

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ৫৩৪

৮। Hudson, W.H.: An Introduction to the Study of literature, Chapter I, Gorge G. Harrap and Company, 2nd edition 1931, London, p. 11 (www.ebooksread.com)

৯। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ: সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০

১০। দে, নাড়ুগোপাল : বাংলা ভাষায় সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম ভাবুক, বঙ্কিমচন্দ্র : কালের ভাবনায়, এবং মুশায়েরা, প্রথম: জুলাই ২০১৬, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৯৪

১১। ওহদেদার, আদিত্য: সমালোচক রবীন্দ্রনাথ, এভারেস্ট বুক হাউস, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. ৩

১২। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র: আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প, বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮১ সাল, কাঁঠালপাড়া, পৃ. ২২১

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র, ১৪২২, কলকাতা, পৃ. ৬১৯

১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ৬২০

১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ৬২০

১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ৬২১

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থখণ্ড, বিশ্বভারতী, তদেব, পৃ. ৬২১

১৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের সামগ্রী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, মজুমদার লাইব্রেরি, ১৩১০ সাল, কলকাতা, পৃ. ৩১৭

১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের সামগ্রী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় বর্ষ, তদেব, পৃ. ৩১৯

২০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের সামগ্রী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় বর্ষ, তদেব, পৃ. ৩২০

২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের সামগ্রী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় বর্ষ, তদেব, পৃ. ৩২২

২২। বসু, চন্দ্রনাথ: নোবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য, বঙ্গদর্শন, সপ্তম খণ্ড, সপ্তম বর্ষ, বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী রাধানাথ বন্দ্যোপাদ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে, কাঁঠালপাড়া, পৃ. ২৪

২৩। মজুমদার, মোহিতলাল: বঙ্কিম-বরণ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, তৃতীয় সংস্করণ: ১৩৮৫, কলকাতা, পৃ. ১৯৬

২৪। ওহদেদার, আদিত্য: সমালোচক রবীন্দ্রনাথ, এভারেস্ট বুক হাউস, তদেব, পৃ. ৩